ইউনিট ৫ গাভী পালন

ইউনিট ৫ গাভী পালন

সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষ গাভী পালন করে আসছে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, মিশরীয় ও ভারতীয় সভ্যতার বিবরণ থেকে জানা যায়, জীবিকা হিসেবে সমাজবদ্ধ মানুষের সভ্যতায় পশুপালন সমাদৃত ছিল। কৃষির অগ্রগতি ও বিকাশের সাথে পশুপালন, গাভী পালন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আজকের বিশ্বে যেখানেই কৃষি বিকাশ লাভ করেছে গাভীর দুধ উৎপাদন ও ব্যবহার সেখানেই শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বাংলাদেশে পশুপালন একটি প্রাচীন পেশা। কিন্তু অন্যান্য পেশা ও জীবিকার মতো এটি তেমনভাবে বিকশিত হয় নি। অবশ্য বিগত কয়েক বছর যাবৎ গাভী পালন ও দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠায় মানুষের মধ্যে কিছুটা সাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের পশুসম্পদ অধিদপ্তরের এক হিসেবে বলা হয়েছে, বর্তমানে এদেশে প্রায় ৩০ হাজার ব্যাক্তিমালিকানাধীন পারিবারিক দুগ্ধ খামার (homestead dairy farm) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। বিগত ১৯৮৩-'৮৪ সালের কৃষি শুমারির তথ্য মোতাবেক এ গাভীগুলোর মধ্যে শতকরা মাত্র ৫টি উন্নত জাতের, যেমন- হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান, জার্সি, শাহিওয়াল, সিন্ধি প্রভৃতি। বাকি সবই অনুন্নত জেবু টাইপের দেশী গাভী যাদের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কম। কিন্তু এরা আমাদের পরিবেশ ও পালন পদ্ধতিতে বেশ টেকসই। অথচ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লালনপালন ও প্রজনন করালে এদের উৎপাদন ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে। ফলে খামারির আয়-রোজগারও বেড়ে যাবে।

এই ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে গাভীর বাসস্থান ও পরিচর্যা, খাদ্য, স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন ও রোগপ্রতিরোধ পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৫.১ গাভীর বাসস্থান ও পরিচর্যা

এই পাঠ শেষে আপনি–

- গাভীর বাসস্থান কী তা বলতে পারবেন।
- গাভীর ঘর তৈরির শর্তগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- ঘরে প্রতিটি গাভীর জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ লিখতে পারবেন।
- গাভীর পরিচর্যা বলতে কী বোঝায় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- গাভী পরিচর্যার বিভিন্ন কৌশলগুলো আলোচনা করতে পারবেন।

গাভীর বাসস্থান

গাভীর বাসস্থানকে গোশালা বলে। এদেশে গোয়াল ঘরও বলা হয়। আর যারা গাভী পালন করে দুধের ব্যবসা করেন তাদেরকে গোয়ালা বলে। কাজেই গোয়াল ঘর বা গোশালা, গোয়ালা ও দুধের মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানে গাভী হচ্ছে কেন্দ্রিক জীবন্ত বস্তু। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দু'টি পন্থায় গাভী পালন করা হয়, যথা– ১. চারনভূমিতে গরু চরানোর মাধ্যমে ও ২. গোশালায় বেঁধে রেখে খাদ্য পরিবেশন ও মলমূত্র নিষ্কাশনের মাধ্যমে। আমাদের দেশে এর কোনোটিই বিকশিত হয়নি। এজন্য গোশালা বা গোয়াল ঘরে গাভী প্রতিপালনই এদেশে গাভী পালনের পদ্ধতি হিসেবে সমাদ্রিত। এ গোশালা বাড়ির অনতিদ রে (৪৫-৬০ মিটার) একটি উঁচু জায়গায় নির্মাণ করা শ্রেয়, যাতে দুর্গন্ধ ও গরুর মলমূত্র থেকে মানুষের সমস্যা সৃষ্টি না হয়। গোশালার জায়গা নির্বাচনে চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, যথা- ১. যথাযথ নর্দমা ও পয়ঃপ্রনালীর ব্যবস্থা, ২. লোকালয় থেকে দূরে স্থাপন করা ৩. উত্তরদক্ষিণমুখী হওয়া ও ৪. চারনভূমির সুবিধা বা গাভী বাইরে আনা-নেয়ার সুবিধা থাকা। এরপর গোশালা নির্মাণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। যথা-

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দুভাবে গাভী পালন করা হয়, যথা- ১. চারনভূমিতে গরু চরানোর মাধ্যমে ও ২. গোশালায় বেঁধে রেখে খাদ্য পরিবেশন ও মলমূত্র নিষ্কাশনের মাধ্যমে। এদেশে গোশালা বা গোয়াল ঘরে গাভী পালনই সমাদ্রিত।

- শুষ্ক পরিবেশ ও আবহাওয়ায় গোশালা তৈরি করতে হবে। গোশালার মেঝে যে দ্রব্যসামগ্রী দিয়েই তৈরি করা হোক না কেন তা অবশ্যই শুষ্ক রাখতে হবে।

- গোশালাটি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন তাতে সহজেই প্রচুর আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে এবং তাপ, আর্দ্রতা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- গোশালা কোনোক্রমেই স্যাঁতস্যাঁতে হওয়া চলবে না। এতে গাভীর বিভিন্ন পরজীবী বা জীবাণুঘটিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- গোশালা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন তাতে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করতে না পারে।
- গোশালাটি মজবুত ও আরামদায়ক হওয়া চাই। বিশ্রাম ও ব্যায়াম করার জন্য গোশালায় প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- গোশালা যেন সহজেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা যায় এবং পানি নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকে।
- গোশালা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন তা গাভীর জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়।

গাভীর বাসস্থান তৈরির মূলে থাকছে নিরাপত্তা ও দুর্যোগ-দুর্বিপাক থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা। একই সাথে খাদ্য পরিবেশন, মলমূত্র নিষ্কাশন, আরাম-আয়েস, যত্ন ও পরিচর্যার সবরকম ব্যবস্থা।

অতএব, গাভীর বাসস্থান তৈরির মূলে থাকছে গাভীর নিরাপত্তা ও দুর্যোগ-দুর্বিপাক থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা। একই সাথে খাদ্য পরিবেশন, মলমূত্র নিষ্কাশন, আরাম-আয়েস, যত্ন ও পরিচর্যার সবরকম ব্যবস্থা।

গোশালার উচ্চতা ২.৭৫-৩.০ মিটার (৯-১০ ফুট) হতে হবে। খাদ্য পরিবেশনের জন্য চাড়ি বা গামলা ও পানির পাত্র গোশালায় থাকতে হবে। প্রতিটি চাড়ি বা গামলা ও পানির পাত্রের পরিসর হবে যথাক্রমে ১.০ মিটার × ১.২ মিটার (৪০ ইঞ্চি × ৪৮ ইঞ্চি) ও ০.৩ মিটার × ০.৬ মিটার (১২ ইঞ্চি× ২৪ ইঞ্চি)। গোশালার প্রতিটি গাভীর জন্য আড়পাতা (chute) থাকে যেখানে গাভী বেঁধে রাখতে হয়। খাবারের চাড়ি পাকা কনক্রিট ও আড়পাতা মসৃণ লোহার রড বা বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। মেঝে যাতে পিচ্ছিল না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে তৈরি করতে হয়। প্রতিটি গাভীর জন্য ৫ বর্গ মিটার জায়গাই যথেষ্ট। আবার বড় দুগ্ধ খামারগুলোতে দু'সারিতে গাভী পালন করা হয়। এখানে দু'ভাবে গাভী রাখা হয়, যেমন- মুখোমুখি ও বিপরীতমুখি করে। মুখোমুখি পালনের ক্ষেত্রে ঘর ১১ মিটার (৩৬ ফুট) প্রশস্থ হবে এবং বিপরীতমুখি পালনের ক্ষেত্রে ঘর ১০.৪ মিটার (৩৪ ফুট) প্রশস্থ হবে।

বড় দুগ্ধ খামারগুলোতে দুসারিতে গাভী পালন করা হয়, যথা- মুখোমুখি ও বিপরীতমুখি।

চিত্র ৬০ ঃ একটি আধুনিক গোশালার ভিতরের দৃশ্য

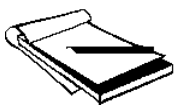

অনুশীলন (Activity) ঃ *ধরুন, আপনার খামারে ৮টি দুগ্ধবতী গাভী আছে। এদের জন্য সর্বমোট কতটুকু জায়গার প্রয়োজন হবে? (সূত্রঃ একটি গাভীর জন্য ৫ বর্গ মিটার জায়গার প্রয়োজন)*

গাভীর পরিচর্যা

গাভী পরিচর্যার লক্ষ্য হলো গাভী যাতে সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্যবতী ও কর্মক্ষম থাকে সে ব্যবস্থা করা। গাভী পরিচর্যার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে। যথা–

গাভী পরিচর্যার জন্য স্বাস্থ্য ও আচরণসংক্রান্ত পরিচর্যা, সাধারণ দোষক্রট নিরাময় সংক্রান্ত পরিচর্যা, প্রজনন ও প্রসব সংক্রান্ত পরিচর্যা, দোহনকালের পরিচর্যা ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে।

- স্বাস্থ্য ও আচরণসংক্রান্ত পরিচর্যা,
- সাধারণ বদঅভ্যাস বা দোষক্রটি নিরাময়সংক্রান্ত পরিচর্যা,
- প্রজনন ও প্রসবসংক্রান্ত পরিচর্যা,
- দোহনকালের পরিচর্যা ইত্যাদি।

১) স্বাস্থ্য ও আচরণসংক্রান্ত পরিচর্যা ঃ স্বাস্থ্য ও আচরণসংক্রান্ত পরিচর্যা বলতে সাধারণ স্বাস্থ্যের উপর শুভ প্রতিক্রিয়া করে এমন ধরনের কর্মকান্ড সম্পাদনকে বুঝায়। যেমন– গাভীর শরীর আচড়ানো (grooming), ব্যায়াম, খুর কাটা, শিং সাজানো ও শিংছেদন (dehorning) ইত্যাদি। এসব পরিচর্যায় গাভীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং উৎপাদনে শুভ প্রভাব পড়ে।

কোনো কোনো গাভীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বদঅভ্যাস বা দোষক্রটি দেখা যায়। উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে কিছু দোষক্রটি নিরাময় করা সম্ভব।

২) সাধারণ বদঅভ্যাস বা দোষক্রটি নিরাময় ঃ কোনো কোনো গাভীর মধ্যে দুধ দোহনের সময় দোহনকারিকে লাথি মারা, নিজের বাট চোষা বা ঘরের বেড়া ভাঙ্গা প্রভৃতি বদঅভ্যাস দেখা যায়। একবার এসব বদঅভ্যাস কোনো গাভীকে পেয়ে বসলে তা ঠিক করা বেশ কঠিন। তবে, উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে কিছু দোষক্রটি নিরাময় করা সম্ভব। যেমন- দুধ দোহনের সময় লাথি মারা সাধারণত প্রথমবার বাচ্চা দেয়া বা নবীন গাভীর (heifer) বেলায় দেখা যায়। এক্ষেত্রে গাভীর লাথি মারার প্রকৃত কারণ জেনে সে অনুযায়ী তা প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ না জেনে আন্দাজের ওপর প্রতিকারের ব্যাবস্থা নিলে গাভীর মধ্যে এটি সব সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে। তখন সে গাভীর দুধ দোহনের জন্য শিকল বা রশি দিয়ে তার দুপা বাধা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এই রকম আরও যেসব বদঅভ্যাসের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো নিরাময়ের কিছু পন্থা উদ্ভাবন করা যেতে পারে। যেমন- বাট চোষনের বেলায় শিকল বা ষাঁড়ের নাকে পরানোর আংটি গাভীর নাকে পরিয়ে দেয়া যায় অথবা কাঁটাযুক্ত ঠোনা (muzzle strap) বা ঠুলি চাপিয়ে দিলে গাভী বাট চুষতে পারে না। বেড়া ভাঙ্গার অভ্যাস নিরাময় কঠিন, তবে আক্রমণাত্বক দোষযুক্ত হলে গাভীর নাকে শক্ত হাতে ঘুষি মারা যেতে পারে।

গাভীর গর্ভধারণকাল ও ঋতুচক্রের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ২৮১±৫ ও ২১±৩ দিন। বাচ্চা প্রসবের ৭৫-১১০ দিনের মধ্যে গাভীকে পাল দেয়ানো উচিত। প্রসব ও পরবর্তী গর্ভধারণের মধ্যে ৬০ দিনের বেশি ছাড় দেয়ার প্রয়োজন নেই।

৩) প্রজনন ও প্রসবসংক্রান্ত পরিচর্যা ঃ গাভীর প্রজনন ও প্রসবসংক্রান্ত পরিচর্যা করতে হলে এদের শারীরতত্ত্বের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। গাভীর গর্ভধারণকাল ও ঋতুচক্রের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ২৮১±৫ ও ২১±৩ দিন। বাচ্চা প্রসবের ৭৫-১১০ দিনের মধ্যে গাভীকে পাল দেয়ানো উচিত। প্রসব ও পরবর্তী গর্ভধারণের মধ্যে ৬০ দিনের বেশি ছাড় দেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা এ সময়ের মধ্যে জরায়ু স্বাভাবিক হয়ে যায়। এসব বিষয় বিরেচনা করে গাভীর পরিচর্যা করতে হবে। এতে গাভীর দুধ উৎপাদন সঠিক হবে। কোনো গাভীকে একবার গর্ভধারণ করাতে যে সংখ্যক পাল দিতে হয় সে সংখ্যা দিয়ে তার প্রজনন দক্ষতা (breeding efficiency) যাচাই করা হয়। গর্ভধারণ ও প্রসবকালে গাভীকে সঠিকভাবে যত্ন ও পরিচর্যা করতে হয়। এই সময় অবহেলা ও অবজ্ঞা করলে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যেতে পারে; তাছাড়া গাভীর প্রজনন ও গর্ভধারণ ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রসবকাল যতই অগ্রসর হয় ততই গাভীর বহিঃযৌনাঙ্গের চামড়া মসৃণ হয়ে ওঠে। লেজের দুপাশের লিগামেন্ট অবসন্ন হয়ে পড়ে ও ওলান ফুলে ওঠে। গাভীর মধ্যে অস্থির ভাব দেখা যায়। এই সময় গাভীকে নিকটস্থ পশু হাসপাতালে নিয়ে ভেটেরিনারি সার্জনের সাহায্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হয়। গাভীকে রেচক খাবার (laxative feed), যেমন- ভুশি ও খৈল খেতে দিতে হয়। প্রসবের প্রথম লক্ষণ দেখা দিলেই গাভীকে শান্ত রেখে পর্যবেক্ষণ করা উচিত যাতে প্রাকৃতিকভাবে প্রসব কাজটি নির্বিঘ্নে হতে পারে। যদি ২/৩ ঘন্টা পর প্রসব প্রক্রিয়া আর অগ্রসর না হয় তাহলে নিকটস্থ ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শ নিতে হবে। এ সময় জরায়ুতে বাছুরের অবস্থান নিরীক্ষণ করা দরকার। যদি সামনের পা দু'টো ও মাথার অবস্থান সামনের দিকে না হয় তাহলে ভেটেরিনারি সার্জনের সহায়তা নেয়া অপরিহার্য। বাছুর ভূমিষ্ট হলে ২/৩ দিন

জরায়ুতে বাছুরের সামনের পা দুটো ও মাথার অবস্থান যদি সামনের দিকে না হয় তাহলে ভেটেরিনারি সার্জনের সহায়তা নেয়া অপরিহার্য।

গাভীর সাথে ছেড়ে দেয়াই উত্তম। প্রতিটি পর্যায়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বাছুর ও গাভী কোনো দুর্বিপাকে না পড়ে। বাছুর প্রসবের পর গাভীকে খাবার ও ঈষদুষ্ণ পরিষ্কার পানি পরিবেশন করতে হবে। এরপর ২/৩ দিন রেচক খাবার পরিবেশন বাঞ্ছনীয়। গাভীর গর্ভফুল (placenta) না পড়া পর্যন্ত সযত্ন দৃষ্টি রাখতে হবে। বাছুরের নাভি নির্জীবাণু পন্থায় কাটা প্রয়োজন। বাচ্চা প্রসবের পর গাভীর ওজন কমে যায়। বেশি খাবার পরিবেশন করে ও সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে তা পুষিয়ে দিতে হবে।

ওলান থেকে দুধ ছেড়ে দেয়া একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া যা সম্পর্ণ দোহনে অত্যাবশ্যক। কাজেই দুধ দোহনের সময় ভিতিপ্রদ ও নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ থেকে গাভীকে মুক্ত রাখতে হবে।

৪) দুগ্ধ দোহনকালের পরিচর্যা ঃ দুগ্ধ দোহন নিজেই একটি অতিসংবেদনশীল প্রক্রিয়া। দোহনের মূল লক্ষ্য হলো এমনভাবে দোহন করতে হবে যাতে ওলান থেকে সম্পর্ণ দুধ টেনে বের করে আনা যায়। ওলান থেকে দুধ ছেড়ে দেয়া (let down) একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া যা সম্পর্ণ দোহনে অত্যাবশ্যক। সুতরাং সকল প্রকার ভিতিপ্রদ ও নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ থেকে গাভীকে মুক্ত রাখতে হবে। দুধ দোহনের সময় দু'টো অত্যাবশ্যক কাজ সম্পাদন করতে হবে, যথা- ১. অযথা গাভীকে উত্তেজিত করা থেকে বিরত থাকা ও ২. দ্রুততার সাথে দোহনকাজ শেষ করা। দুধ দোহনকালে গাভীকে সম্পর্ণ শান্ত ও সুস্থির রাখতে হবে। এই সময় মশামাছি উৎপাত করলে গাভীর দোহন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

চিত্র ৬১ ঃ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গাভীর দুগ্ধ দোহন

গাভী পরিচর্যার আর একটি লক্ষ্য হচ্ছে গাভীকে পোকামাকড় ও মশামাছি থেকে নিরাপদ দুরত্বে রাখা। তাছাড়া গাভীর পেটে যাতে কৃমির ডিম প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য খাদ্য পরিবেশনে সদাসতর্ক থাকতে হবে।

সারমর্ম ঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দু'ভাবে গাভী পালন করা হয়, যথা- ১. চারণভূমিতে গরু চরানোর মাধ্যমে ও ২. গোশালায় বেঁধে রেখে খাদ্য পরিবেশন ও মলমূত্র নিষ্কাশনের মাধ্যমে। এদেশে গোশালা বা গোয়াল ঘরে গাভী পালনই সমাদ্রিত। গাভীর বাসস্থান তৈরির মূলে থাকছে নিরাপত্তা ও দুর্যোগদুর্বিপাক থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা। একই সাথে খাদ্য পরিবেশন, মলমূত্র নিষ্কাশন, আরাম-আয়েস, যত্ন ও পরিচর্যার সব রকম ব্যবস্থা। প্রতিটি গাভীর জন্য ৫ বর্গ মিটার জায়গাই যথেষ্ট। বড় দুগ্ধ খামারগুলোতে দুসারিতে গাভী পালন করা হয়, যথা- মুখোমুখি ও বিপরীতমুখি। গাভী পরিচর্যার লক্ষ্য হলো গাভী যাতে সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্যবতী ও কর্মক্ষম থাকে সে ব্যবস্থা করা। গাভী পরিচর্যার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে। যথা– স্বাস্থ্য ও হাবভাবগত পরিচর্যা, সাধারণ বদঅভ্যাস বা দোষত্রুটি নিরাময়গত পরিচর্যা, প্রজনন ও প্রসবগত পরিচর্যা, দোহনকালের পরিচর্যা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। গোয়াল ঘর বাড়ি থেকে কত দূরে তৈরি করা শ্রেয়?
- ক) ২৫-৩০ মিটার
- খ) ১০-১৫ মিটার
- গ) ২০-২৫ মিটার
- ঘ) ৪৫-৬০ মিটার

২। গাভীর ঘরের উচ্চতা কত হওয়া উচিত?
- ক) ১.৭৫-২.০০ মিটার
- খ) ২.৭৫-৩.০০ মিটার
- গ) ৩.৭৫-৪.০০ মিটার
- ঘ) ৪.৭৫-৫.০০ মিটার

৩। গাভীর গর্ভধারণকাল ও ঋতুচক্রের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে কত?
- ক) ২৮১$\pm$৫ ও ২১$\pm$৩ দিন
- খ) ২৮০$\pm$২ ও ১৮$\pm$৩ দিন
- গ) ২৭০$\pm$৩ ও ২৫$\pm$৩ দিন
- ঘ) ২৭৫$\pm$৫ ও ২১$\pm$২ দিন

৪। বাছুরের জন্মের কত দিন পর্যন্ত গাভীকে রেচক খাবার দেয়া উচিত?
- ক) ১০/১২ দিন
- খ) ৭/৮ দিন
- গ) ২/৩ দিন
- ঘ) ৮/১০ দিন

পাঠ ৫.২ গাভীর খাদ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- গাভীর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।
- সুষম খাদ্য কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।
- গাভীর জন্য সুষম খাদ্য হিসেব করে তৈরি করতে পারবেন।
- গাভীর দানাদার খাদ্য ও সুষম খাদ্যতালিকা উল্লেখ করতে পারবেন।
- গাভীর খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

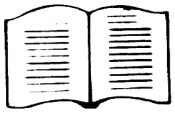

গাভীর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

গাভীর শারীরিক বৃদ্ধি, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, দেহ সংরক্ষণ ও কোষকলার ক্ষয়পূরণ, দুধ ও মাংস উৎপাদন, প্রজননে সক্ষমতা অর্জন, গর্ভস্থ বাচ্চার বিকাশ সাধন প্রভৃতি কাজের জন্য উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য খাদ্যদ্রব্যের চাহিদায় বেশ তারতম্য হয়। যেমন- দেহের ক্ষয়পূরণ, দেহকে কর্মক্ষম রাখা প্রভৃতি কাজে যে পরিমাণ পুষ্টির প্রয়োজন হয় দুধ, মাংস প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য সেগুলো ছাড়াও অতিরিক্ত পুষ্টির প্রয়োজন পড়ে। খাদ্যদ্রব্যের বিভিন্ন উপাদানসমূহ সম্পর্কে ইতোপূর্বে বাছুর পালন ইউনিটে বলা হয়েছে; এই উপাদানগুলো গাভীর জন্যও প্রয়োজন। তবে দুধ উৎপাদন গাভীর জন্য একটি বিশেষ ধরনের কাজ বলে এজন্য গাভীর খাদ্য যোগানের ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। খাদ্যদ্রব্যের কোনো উপাদানের অভাব হলে গাভীর দেহে তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। শক্তির জন্য শর্করা, দেহের ক্ষয়পূরণ ও উৎপাদনের জন্য আমিষ, স্নেহ, খণিজ, ভিটামিন এবং সমুদয় জৈব রাসায়নিক কর্মকান্ডের জন্য প্রচুর বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজন হয়। সকল অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্যকে পরিপাচ্য পুষ্টি (digestible nutrients) নামে উল্লেখ করা হলেও পরিপাচ্য পুষ্টি বলতে শর্করা, স্নেহ ও আমিষকেই বোঝানো হয়। বিভিন্ন খাদ্যের পরিপাচ্য পুষ্টির মানে পার্থক্য থাকে। শর্করা যে শক্তি দেয় আমিষও সে পরিমাণ শক্তি যোগায়। কিন্তু স্নেহ পদার্থ, শর্করা ও আমিষের চেয়ে ২.২৫ গুণ বেশি শক্তি দেয়। আমিষ শুধু শক্তিই দেয় না, শরীর গঠনের মৌলিক জৈব উপাদান তথা অ্যামাইনো অ্যাসিডও দিয়ে থাকে। খণিজপদার্থ ও ভিটামিন কোনো শক্তি দেয় না, কিন্তু এগুলোর উপস্থিতি ব্যতিরেকে শরীরের কর্মচাঞ্চল্য বা উৎপাদন কোনো কিছুই ঠিকমতো হয় না। এগুলো শরীরে খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হলেও অত্যাবশ্যক; অতএব এসব খাদ্যের শ্রেণী ও প্রকৃতি বিবেচনা করে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের সমন্বয়ে গাভীর সার্বিক প্রয়োজনে সুষম খাদ্য (balanced diet) প্রস্তুত করতে হয়।

গাভীর শারীরিক বৃদ্ধি, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, দেহ সংরক্ষণ ও ক্ষয়পূরণ, দুধ ও মাংস উৎপাদন, প্রজননে সক্ষমতা অর্জন, গর্ভস্থ বাচ্চার বিকাশ প্রভৃতির জন্য উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন।

শর্করা যে শক্তি দেয় আমিষও সে পরিমাণ শক্তি যোগায়। কিন্তু স্নেহ পদার্থ, শর্করা ও আমিষের চেয়ে ২.২৫ গুণ বেশি শক্তি দেয়।

সুষম খাদ্য (Balanced diet)

যেসব খাদ্য মিশ্রণে পশুর দৈহিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ও অনুপাতে সব রকম পুষ্টি উপাদান থাকে সেগুলোকে সুষম খাদ্য বলে। প্রতিটি গাভীর জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। কারণ খাদ্যে বিভিন্ন উপাদানের সুষমতার অভাব হলে গাভী তার প্রয়োজন অনুযায়ী পুষ্টি উপাদান পায় না। ফলে দেহগঠন ও উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। সুষম খাদ্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ করবে-

- এটি রুচিকর (palatable) হবে,
- পরিমাণ ও আকারে (bulk) সঠিক হবে,
- সুস্বাদু হবে এবং
- দামে সস্তা হবে।

যেসব খাদ্য মিশ্রণে পশুর দৈহিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ও অনুপাতে সব রকম পুষ্টি উপাদান থাকে সেগুলোকে সুষম খাদ্য বলে।

গাভীর খাদ্যদ্রব্য সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত, যেমন- আঁশযুক্ত খাদ্য, দানাদার খাদ্য ও ফিড অ্যাডিটিভস্।

গাভীর খাদ্যদ্রব্য সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন- আঁশযুক্ত খাদ্য (roughages), দানাদার খাদ্য (concentrates) ও ফিড অ্যাডিটিভস্ (feed additives) আঁশযুক্ত খাদ্যের মধ্যে খড়বিচালি, কাঁচা ঘাস, লতাপাতা, সাইলেজ (silage) ইত্যাদিই প্রধান। দানাদার খাদ্যের মধ্যে বিভিন্ন শস্যদানা, গমের ভুশি, চালের কুড়া, খৈল ইত্যাদিই প্রধান। ফিড অ্যাডিটিভস্-এর মধ্যে ঝিনুকচূর্ণ, বিভিন্ন ভিটামিন ও খণিজপদার্থ প্রভৃতি রয়েছে। এসব পশু খাদ্য প্রয়োজনমতো সংগ্রহ করে গাভীকে

পরিবেশন করতে হবে। পশুকে যে পরিমাণ খাদ্য পরিবেশন করতে হয় তা এক ধরনের থাম্ব রুল (thumb rule) নিয়মে নিরূপন করা যেতে পারে। যেমন-

- প্রতিদিন একটি গাভী যে পরিমাণ মোটা আঁশযুক্ত খাদ্য খেতে পারে তাকে তা খেতে দেয়া।
- প্রতি ১.৫ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য গাভীকে খড় ও কাঁচা ঘাসের সঙ্গে প্রতিদিন ০.৫ কেজি দানাদার খাদ্য দিতে হবে।
- শুধু খড় খেলে প্রতি ১.২৫ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য গাভীকে প্রতিদিন ০.৫ কেজি অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য প্রদান করতে হবে।

পশু পুষ্টি বিদ্যায় প্রতি ৪৫.৫ কেজি (১০০ পাউন্ড) দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে খাদ্যতালিকা বা রসদ বরাদ্দের নীতিও চালু আছে। প্রতি ৪৫.৫ কেজি (১০০ পাউন্ড) দৈহিক ওজনের জন্য ০.৯ কেজি (২ পাউন্ড) আঁশযুক্ত খাদ্য বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। এই নীতি অনুযায়ী প্রথম ২.৪ কেজির জন্য ২.৪ কেজি ও পরবর্তী প্রতি ০.৯ কেজি উৎপাদনের জন্য ০.২৩ কেজি দানাদার খাদ্য বরাদ্দ করে রসদ যোগান দিতে হবে।

খাদ্য তৈরি ও হিসাব পদ্ধতি

গাভীর খাদ্য তৈরিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। যথা-

- গাভীর জন্য সবুজ ঘাস অগ্রগণ্য।
- খাদ্য তাজা ও দোষমুক্ত হতে হবে।
- ঘাসের পবির্তে অন্য রসালো খাদ্য (succulent feed), যথা- সাইলেজ (silage), মূলা, শালগম, মিষ্টিআলু ইত্যাদি শুকনো ঘাস বা খড়ের সাথে মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে।

ডালজাতীয় ঘাস পুষ্টিকর; তবে এগুলো ভুট্টা, নেপিয়ার ইত্যাদির সাথে মিশিয়ে না দিলে ডায়রিয়ার সম্ভাবনা থাকে।

- ডালজাতীয় ঘাস পুষ্টিকর; তবে এগুলো ভুট্টা, নেপিয়ার ইত্যাদির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে কেননা, শুধু ডালজাতীয় ঘাস খাওয়ালে ডায়রিয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- নেপিয়ার ঘাসের কান্ড শক্ত হলে কেটে টুকরো টুকরো করে দিতে হবে। জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি ঘাস কচি অবস্থায় কখনো খাওয়াতে নেই; কেননা এই ঘাসে কচি অবস্থায় প্র€সিক অ্যাসিড (prusic acid) নামক এক প্রকার মারাত্নক বিষ থাকে। তাই এই ঘাস বেশি খাওয়ালে গাভী মারা যাওয়া সম্ভাবনা থাকে।
- ডাল, গম, ভুট্টা প্রভৃতি দানাদার খাদ্যগুলো ভেঙ্গে খাওয়াতে হবে। তবে, গুঁড়ো মিহি করে খাওয়ানো ঠিক নয়।
- পশুর হজমশক্তি কমে গেলে খাদ্য সিদ্ধ করে খাওয়ালে সহজে হজম হয়।

পশুর আকার, দেহজাত উৎপাদন, শ্রমের পরিমাণ, বয়স ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে পরিমিত খাদ্য ও আমিষ সরবরাহ করতে হবে।

- পশুর আকার, দেহজাত উৎপাদনের পরিমাণ, শ্রমের পরিমাণ, বয়স ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে পরিমিত খাদ্য ও আমিষ সরবরাহ করতে হবে।
- ৪৫৫ কেজি ওজনের একটি গাভী শুধু অলসভাবে কাটালে দৈনিক তার ২.৭৩ কেজি মোট পরিপাচ্য পুষ্টি বা টি.ডি.এন. (total digestible nutrients or T.D.N.) ও ২৭৩ গ্রাম পরিপাচ্য আমিষ বা ডি.পি.-এর (digestible protein or D.P.) প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই গাভী যদি উৎপাদন বা শ্রমের কাজ করে তবে প্রয়োজনীয় টি.ডি.এন. ও ডি.পি.-এর জন্য অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হবে।

প্রতি ১০০ কেজি শারীরিক ওজনের জন্য একটি গাভীর দৈনিক ২-৩ কেজি শুকনো খাদ্য গ্রহণের দরকার হয়।

- প্রতি ১০০ কেজি শারীরিক ওজনের জন্য একটি গাভীর দৈনিক ২-৩ কেজি শুকনো খাদ্য গ্রহণের দরকার হয়। সুতরাং ৪৫৫ কেজি ওজনের একটি গাভী দৈনিক প্রায় ৯.১০-১১.৩৬ কেজি শুষ্ক পদার্থ বা ডি.এম. (dry matter or D.M.) খেতে পারে।
- তবে, পশু যা কিছু খাবে তার ডি.এম. যেন ১১.৩৬ কেজির বেশি না হয় এবং এই খাদ্যের টি.ডি.এন. ২.৭৩ কেজি ও ডি.পি. ২.৭৩ কেজি হতে হবে।
- মনে করুন, একটি গাভীকে শুধু ভুট্টা ঘাস খাওয়ানো হচ্ছে। প্রতি একশ ভাগ ভুট্টা ঘাসে প্রায় ২০% ডি.এম. থাকে। সুতরাং ৪৫৫ কেজি ওজনের একটি গাভী যদি অলস হয় তবে অলস অবস্থায় তাকে ৪৫.৫ কেজি ভুট্টা ঘাস খেতে দিতে হবে।

এখন দেখা যাক, ৪৫.৫ কেজি ভুট্টা ঘাসে কী পরিমাণ ডি.পি. ও টি.ডি.এন. আছে। খাদ্য উপাদানসমূহের তালিকায় দেখা যায়- ৪৫.৫ কেজি ভুট্টায় ১.২% ডি.পি. ও ১৬.৩% টি.ডি.এন. থাকে। সুতরাং যদি ঐ গাভীকে ৪৫.৫ কেজি ভুট্টা ঘাস খাওয়ানো যায় তাহলে প্রয়োজনের তুলনায় সে প্রায় দ্বিগুণ ডি.পি. ও টি.ডি.এন. পেয়ে থাকে। অর্থাৎ তাকে ২২.৭৫ কেজি ঘাস খাওয়ালে তার দৈহিক চাহিদা প্রায় মিটে যায়। আর ঐ গাভী যদি দৈনিক ৪.৫৫ কেজি করে দুধ (৪% বাটার ফ্যাটসম্মৃদ্ধ) দেয় তাহলে তাকে অতিরিক্ত খাদ্য দিতে হবে। তালিকা অনুসারে ৪.৫৫ কেজি দুধ উৎপাদনের জন্য ১৮৬ গ্রাম ডি.পি. ও ১.৪১ কেজি টি.ডি.এন.-এর প্রয়োজন। তালিকা দেখে আমরা বলতে পারি যে, প্রতি কেজি ভুট্টা ঘাসে ৬ গ্রাম ডি.পি. এবং ৭২.৭৩ গ্রাম টি.ডি.এন. থাকে। কাজেই ১৫.৯ কেজি দুধ দেয় (৪% বাটার ফ্যাটসম্মৃদ্ধ) এমন গাভীকে (২২.৭৫+১৫.৯) = ৩৮.৬৫ কেজি ভুট্টা ঘাস খাওয়ালে তার খাদ্য চাহিদা পূরণ হয়। কার্যক্ষেত্রে একটি গাভীর জন্য এই পরিমাণ ভুট্টা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। তাই কিছু ঘাস, খড় ও দানাদার খাদ্য দিয়ে তার পুষ্টি চাহিদা মেটানো যেতে পারে। দানাদার খাদ্যের একটি মিশ্রণ তৈরি করা হলে এতে খৈল ২৫%, গমের ভুশি ২৫%, খেসারির ডাল ২৫%, ভুট্টার গুঁড়ো ২৫% দেয়া যেতে পারে। এ মিশ্রণের প্রতি ০.৪৫৫ কেজিতে প্রায় ১৪% ডি.পি. ও ৭০% টি.ডি.এন. পাওয়া যেতে পারে। যে মিশ্রণে ৬.৬৩ কেজি ডি.পি. ও ৩১.৮ কেজি টি.ডি.এন. থাকে সেখান থেকে ২.২৭ কেজি দানাদার মিশ্রণ গাভীকে খাওয়ানো হলে গাভী তার দেহের জন্য ৩১৮ গ্রাম ডি.পি. পাবে। এই পরিমাণ তার মোট চাহিদার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে–

		ডি.পি. (D.P.)	টি.ডি.এন. (T.D.N.)
দেহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য-		২৭৩ গ্রাম	২.৭৩ কেজি
৪.৫৫ কেজি দুধ (৪% বাটার ফ্যাটসম্মৃদ্ধ) উৎপাদনের জন্য-		১৮৬ গ্রাম	১.৪১ কেজি
	মোট=	৪৫৯ গ্রাম	৪.১৪ কেজি
২২.৭৫ কেজি ঘাস-		২৭৭ গ্রাম	৩.৬৮ কেজি
২.২৭ কেজি দানাদার খাদ্যে-		৩১৮ গ্রাম	১.৫৯ কেজি
	মোট=	১,০৫৪ গ্রাম	৯.৪১ কেজি

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গাভীটিকে দৈনিক ২২.৭৫ কেজি ভুট্টা ঘাস ও ২.২৭ কেজি দানাদার খাদ্য খাওয়ালে পুষ্টি চাহিদা সঠিকভাবে মেটানো সম্ভব হয়।

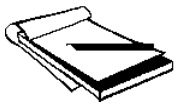

অনুশীলন (Activity) ঃ *৪.৫৫ কেজি দুধ উৎপাদনের জন্য ১৮৬ গ্রাম ডি.পি. ও ১.৪১ কেজি টি.ডি.এন.-এর প্রয়োজন হলে ১০ কেজি দুধ উৎপাদনের জন্য কী পরিমাণ ডি.পি. ও টি.ডি.এন.-এর প্রয়োজন হবে?*

গাভীর দানাদার খাদ্য

সারণি ১৯ (ক, খ, গ ও ঘ)-এ গাভীর দানাদার খাদ্যের কয়েকটি সূত্র দেয়া হয়েছে। গাভীর দানাদার খাদ্য তৈরিতে এগুলো থেকে যে কোনো একটি সূত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারণি ১৯ (ক, খ, গ ও ঘ) ঃ গাভীর দানাদার খাদ্যের সূত্রসমূহ

১৯.ক ঃ প্রথম সূত্র

উপাদান	পরিমাণ (%)
বাদামের খৈল	২৫
গমের ভুশি	২৫
চালের কুড়া	২৫
খেসারির ডাল	২৫

১৯.খ ঃ দ্বিতীয় সূত্র

উপাদান	পরিমাণ (%)
সরিষার খৈল	২৫
গমের ভুশি	২৫
ডালের ভুশি	২৫
বুটের ডাল	২৫

১৯.গ ঃ তৃতীয় সূত্র

১৯.ঘ ঃ চতুর্থ সূত্র

উপাদান	পরিমাণ (%)
তিলের খৈল	২৫
ভুট্টার গুঁড়ো	২৫
গমের ভুশি	২৫
খেসারির ডাল	২৫

উপাদান	পরিমাণ (%)
গম ভাঙ্গা	২৫
নারকেলের খৈল	২৫
গমের ভুশি	২৫
কলাইয়ের ডাল	২৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত সূত্রগুলোর প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রতিটি গাভীকে দৈনিক ১২০ গ্রাম লবণ ও ৬০ গ্রাম খণিজপদার্থ (হাড়ের গুঁড়ো বা অভাবে চকের গুঁড়ো) খাওয়াতে হবে।

উৎস ঃ সম্পাদিত, মার্চ-১৯৮৮। পশুপালন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা, পৃ. ৩৪।

গাভীকে ২৪ ঘণ্টায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য বা খাদ্যসমষ্টি খেতে দেয়া হয় তাকে খাদ্যতালিকা, রসদ বা রেশন বলে।

গাভীর খাদ্যতালিকা বা রসদ (ration)

গাভীকে দৈনিক অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য বা খাদ্যসমষ্টি খেতে দেয়া হয়, তাকে খাদ্যতালিকা, রসদ বা রেশন বলে। সারণি ২০-এ প্রায় ১০০ কেজি ওজনের একটি গাভীর জন্য সুষম খাদ্যতালিকার একটি নমুনা দেখানো হয়েছে।

সারণি ২০ ঃ ১০০ কেজি ওজনের একটি গাভীর সুষম খাদ্যতালিকা

উপাদান	পরিমাণ
ধানের খড়	২.০ কেজি
কুড়া	০.৫ কেজি
গমের ভুশি	০.৫ কেজি
তিলের খৈল	০.২ কেজি
ইউরিয়া	৩৫.০ গ্রাম
চিটাগুড়	০.৫ গ্রাম
সবুজ ঘাস	২.০ গ্রাম
লবণ	২৫.০ গ্রাম

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ দানাদার খাদ্যগুলোতে লবণ ও ইউরিয়া একসাথে মিশিয়ে দিতে হবে। খড় ও সবুজ ঘাস ছোট ছোট করে কেটে এর সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

উৎস ঃ সম্পাদিত, মার্চ-১৯৮৮। পশুপালন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা, পৃ. ৩৫।

সারণি ২১ ও ২২-এ যথাক্রমে ১০০-১৫০ এবং ২০০-২৫০ কেজি ওজনের গাভীর সুষম খাদ্যতালিকার একটি করে নমুনা দেখানো হয়েছে।

সারণি ২১ ঃ ১০০-১৫০ কেজি ওজনের গাভীর সুষম খাদ্যতালিকা

উপাদান	পরিমাণ
ইউরিয়া পানি দিয়ে ভেজানো খড় (৫%)	৫.০ কেজি
সবুজ ঘাস	১.০ কেজি
গমের ভুশি	১.২ কেজি
ধৈইঞ্চা বীজ	০.৫৩ কেজি
লবণ	২৫.০ গ্রাম

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ৫ কেজি খড়ের উপর ইউরিয়া মেশানো পানি (৫%) ভালোভাবে ছিটিয়ে দিয়ে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ৩/৪ দিন পলিথিন কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। খড় ও সবুজ ঘাস একসাথে খাওয়াতে হবে। আর দানাদার খাদ্যের সঙ্গে লবণ মিশিয়ে আলাদাভাবে খাওয়ানো উচিত।

উৎস ঃ সম্প্রদিত, মার্চ-১৯৮৮। পশুপালন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা, পৃ. ৩৫।

সারণি ২২ ঃ ২০০-২৫০ কেজি ওজনের দুগ্ধবতী গাভীর সুষম খাদ্যতালিকা

উপাদান	পরিমাণ
ধানের খড়	৩.০ কেজি
সবুজ ঘাস	৬.০ কেজি
ইউরিয়া	৪৫.০ গ্রাম
গমের ভুশি/কুড়া	২.০ কেজি
তিলের খৈল	০.৫ কেজি
লবণ	৪০ গ্রাম

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ধানের খড় ও সবুজ ঘাস একসাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। ইউরিয়া, গমের ভুশি/কুড়া, তিলের খৈল ও লবণ একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

উৎস ঃ সম্পাদিত, মার্চ-১৯৮৮। পশুপালন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা, পৃ. ৩৬।

গাভীর খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে না পারলে যেমন নষ্ট হয়ে যেতে পারে তেমনি অপর্যাপ্ত সংরক্ষণে খাদ্যের গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গাভীর খাদ্য সংরক্ষণ

গাভীর খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে না পারলে যেমন নষ্ট হয়ে যেতে পারে তেমনি অপর্যাপ্ত সংরক্ষণে খাদ্যের গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই খাদ্য খেয়ে গাভীর রোগব্যাধি হতে পারে। আমাদের দেশে পশু খাদ্য সংরক্ষণের সমস্যা রয়েছে, বিশেষ করে দানাদার খাদ্য। উষ্ণ ও স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে এসব খাদ্য সহজেই পচে যায়। এর প্রধান কারণ আমাদের উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়ায় ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদের বংশবিস্তার ব্যাপক হয় ও সহজে অন্যান্য রোগজীবাণু জন্মায়। কাজেই সব সময় শুকনো পরিবেশে পশু খাদ্য সংরক্ষণ করা উচিত।

মোটা আঁশযুক্ত খাদ্য যেমন কেটে টুকরো টুকরো করার প্রয়োজন রয়েছে তেমনি সহজপাচ্য হওয়ার জন্য কিছু কিছু বীজজাতীয় খাদ্য চূর্ণ করারও প্রয়োজন রয়েছে।

এছাড়া খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুতকরণেও সমস্যা থেকে যায়। মোটা আঁশযুক্ত খাদ্য যেমন কেটে টুকরো টুকরো করার প্রয়োজন রয়েছে তেমনি সহজপাচ্য হওয়ার জন্য কিছু কিছু বীজজাতীয় খাদ্য চূর্ণ করারও প্রয়োজন রয়েছে। কেননা গাভী সব সময় শক্ত বীজ পরিপূর্ণভাবে চিবানো ছাড়াই গিলে ফেলে। এতে

পাকস্থলীতে পাচক রস তেমনভাবে কাজ করে না। ফলে পাচক রসের অপচয় ঘটে। পরিপাকতন্ত থেকে এগুলো মলের সাথে আস্তই বের হয়ে আসে। এই কারণে শক্ত বীজজাতীয় খাদ্য চূর্ণ করেই পরিবেশন করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে খাদ্যদ্রব্য কেটে কুচি কুচি করে (chopping), কিছু ক্ষেত্রে রান্না করে বা ভিজিয়ে খাওয়াতে হতে পারে। খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিমান অক্ষুন্ন রেখেই এভাবে প্রক্রিয়াজাত করার প্রয়োজন রয়েছে।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করার উদ্দেশ্য হলো– খাদ্যকে সহজে হজমের উপযোগী করা, সংরক্ষণকাল বাড়ানো ও অপচয় রোধ করা, গুণগত মান বৃদ্ধি করা, নাড়াচাড়ার সুবিধা এবং মজুদের স্থান বাঁচানো।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ

বহুকাল থেকেই গবাদিপশুর খাদ্যকে প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রচেষ্টা চলছে। খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করার উদ্দেশ্য হলো–

- খাদ্যকে সহজে হজমের উপযোগী করা,
- খাদ্য সংরক্ষণকাল বাড়ানো ও অপচয় রোধ করা,
- খাদ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করা,
- খাদ্য নাড়াচাড়ার সুবিধা এবং
- খাদ্য মজুদের স্থান বাঁচানো।

বহুকাল আগে থেকেই ধানের খড়কে কস্টিক সোডা (১%) মিশ্রিত পানি দিয়ে শোধন করে দেখা গেছে যে, খড় বেশ নরম হয়, ফলে গাভী স্বাভাবিকের তুলনায় কিছু বেশি খড় খায় এবং হজমও হয় বেশ তাড়াতাড়ি। চুন মেশানো পানি দিয়েও প্রায় একই রকম করে খড় শোধন করা যায়। এতে ফলও হয় একই প্রকার। কিন্তু এধরনের ক্ষার (alkali) শোধন প্রক্রিয়া সাধারণ কৃষক বা খামার মালিক পছন্দ করেন না। এই ধরনের শোধন পদ্ধতিতে কিছু অসুবিধাও আছে। যেমন– এতে বড় বড় চৌবাচ্চা লাগে। রাসায়নিক দ্রব্য ও অতিরিক্ত শ্রমিক ও সময়ের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন খরচ মিলিয়ে হিসেব করলে এ পদ্ধতিতে তেমন লাভ হয় না।

৫% ইউরিয়া পানিতে মিশিয়ে খড়ের উপর সমভাবে ছিটিয়ে তা কিছুদিন আচ্ছাদিত করে রাখলে লিগনিন নরম হয়ে যায় ও গবাদিপশু সে খাদ্য খেয়ে সহজে হজম করতে পারে।

বর্তমানে ইউরিয়া (৫%) দিয়ে শোধনে ধানের খড়ের গুণগত মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা জানি, ধানের খড় সেলুলোজ (cellulose) ও হেমিসেলুলোজ (hemicellulose) নামক দুপ্রকার শ্বেতসার এবং লিগনিন (lignin) নামক একপ্রকার কঠিন পদার্থ দিয়ে জটিলভাবে আচ্ছাদিত থাকে। রোমন্থক প্রাণীর পাকস্থলীতে যে অজস্র অনুজীব থাকে, সেগুলোর পক্ষে লিগনিনের আবরণ ভেদ করে সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে বেশ সময় লাগে। প্রমাণিত হয়েছে যে, ৫% ইউরিয়া পানিতে মিশিয়ে খড়ের উপর সমভাবে ছিটালে ও সে খড়কে কিছুদিন আচ্ছাদিত করে রাখলে লিগনিন নরম হয়ে যায় এবং গবাদিপশু সে খাদ্য খেলে তা অতি সহজে হজম হয়ে যায়। খড়ের মাধ্যমে ইউরিয়া পাকস্থলীতে গিয়ে অ্যামোনিয়াতে রূপান্তরিত হয় এবং সে অ্যামোনিয়ার প্রভাবে হজম প্রক্রিয়ায় সহায়ক এসব অনুজীবের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। রোমন্থক প্রাণী অনামিষ নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থকে (N.P.N. or non-protien nitrogenous substance) আমিষে রূপান্তরিত করতে পারে।

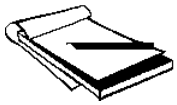

অনুশীলন (Activity) ঃ *ধানের খড় প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে আপনার দৃষ্টিতে কোন্‌টি বেশি উপযোগী? আপনার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।*

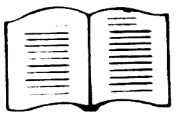

সারমর্ম ঃ গাভীর শারীরিক বৃদ্ধি ও কোষকলার বিকাশ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, দেহ সংরক্ষণ ও কোষকলার ক্ষয়পূরণ, দুধ ও মাংস উৎপাদন, প্রজননে সক্ষমতা অর্জন, গর্ভস্থ বাচ্চার বিকাশ সাধন প্রভৃতি কাজের জন্য উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন। শর্করা যে শক্তি দেয় আমিষও সে পরিমাণ শক্তি যোগায়। কিন্তু স্নেহপদার্থ, শর্করা ও আমিষের চেয়ে ২.২৫ গুণ বেশি শক্তি দেয়। গাভীর খাদ্যদ্রব্য সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন- আঁশযুক্ত খাদ্য, দানাদার খাদ্য ও ফিড অ্যাডিটিভস্। পশুর আকার, দেহজাত উৎপাদনের পরিমাণ, শ্রমের পরিমাণ, বয়স ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে পরিমিত খাদ্য ও আমিষ সরবরাহ করতে হবে। গাভীকে দৈনিক ২২.৭৫ কেজি ভুট্টা ঘাস ও ২.২৭ কেজি দানাদার খাদ্য খাওয়ালে পুষ্টি চাহিদা সঠিকভাবে মেটানো সম্ভব হয়। গাভীকে ২৪ ঘণ্টায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য বা খাদ্যসমষ্টি খেতে দেয়া হয়, তাকে খাদ্যতালিকা বা রেশন বলে। গাভীর খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে না পারলে যেমন নষ্ট হয়ে যেতে পারে তেমনি অপর্যাপ্ত সংরক্ষণে খাদ্যের গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করার উদ্দেশ্য হলো- খাদ্যকে সহজে হজমের উপযোগী করা, সংরক্ষণকাল বাড়ানো ও অপচয় রোধ করা, গুণগত মান বৃদ্ধি করা, নাড়াচাড়ার সুবিধা এবং মজুদের স্থান বাঁচানো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। স্নেহ পদার্থ শর্করা ও আমিষের চেয়ে কত বেশি শক্তি দেয়?
- ক) ২.২৫ গুণ
- খ) ১.২৫ গুণ
- গ) ৩.২৫ গুণ
- ঘ) ৪.২৫ গুণ

২। শুধু খড় খেলে ১.২৫ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য প্রতিদিন গাভীকে কতটুকু দানাদার খাদ্য প্রদান করতে হবে?
- ক) ১.০ কেজি
- খ) ০.৭ কেজি
- গ) ০.৫ কেজি
- ঘ) ০.৮ কেজি

৩। ৪৫৫ কেজি ওজনের একটি গাভী অলসভাবে কাটালে দৈনিক যথাক্রমে তার কতটুকু টি.ডি.এন. ও ডি.পি.-এর প্রয়োজন হবে?
- ক) ২.৭৩ কেজি ও ২০০ গ্রাম
- খ) ২.০০ কেজি ও ২৭০ গ্রাম
- গ) ২.৭৩ কেজি ও ২৭৩ গ্রাম
- ঘ) ২.৫০ কেজি ও ২৫০ গ্রাম

৪। গাভীর দানাদার খাদ্যের সঙ্গে দৈনিক যথাক্রমে কতটুকু করে লবণ ও হাড়ের গুঁড়ো সরবরাহ করা উচিত?
- ক) ১০০ ও ৫০ গ্রাম
- খ) ১২০ ও ৬০ গ্রাম
- গ) ৭৫ ও ৫০ গ্রাম
- ঘ) ১৫০ ও ১০০ গ্রাম

৫। কী দিয়ে ধানের খড় প্রক্রিয়াজাত করা হয়?
- ক) ১% কস্টিক সোডা, চুন বা ৫% ইউরিয়া মিশ্রিত পানি
- খ) ১% কস্টিক সোডা বা চুন মিশ্রিত পানি
- গ) চুন বা ৫% ইউরিয়া মিশ্রিত পানি
- ঘ) ১% কস্টিক সোডা বা ৫% ইউরিয়া মিশ্রিত পানি

৬। ধানের খড়ের প্রাচীরে কী কী জৈব পদার্থ থাকে?
- ক) লিগনিন ও সেলুলোজ
- খ) সেলুলোজ ও হেমিসেলুলোজ
- গ) সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ ও লিগনিন
- ঘ) হেমিসেলুলোজ ও লিগনিন

পাঠ ৫.৩ গাভীর স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন ও রোগপ্রতিরোধ পদ্ধতি

এই পাঠ শেষে আপনি-

- গাভীর স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালনের বিধিব্যবস্থাগুলোর নাম লিখতে পারবেন।
- গাভীর প্রজনন ও প্রসবে নির্জীবাণু পদ্ধতি অবলম্বনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে লিখতে পারবেন।
- কীভাবে অসুস্থ গাভীকে সুস্থগুলোর থেকে পৃথক করবেন ও মৃত গাভীর সৎকার করবেন তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- নাম, ব্যবহার মাত্রা, প্রয়োগ পদ্ধতি ও সময়সহ গাভীর বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

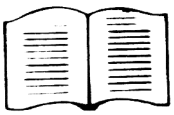

গাভীর স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন বিষয়ে ইতোমধ্যেই গাভীর বাসস্থান ও পরিচর্যা পাঠ থেকে আমরা কিছুটা জেনেছি। এই পাঠে গাভীর স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন বিষয়টি আরও সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন বলতে এমন কতগুলো স্বাস্থ্যগত বিধিব্যবস্থাকে বোঝায় যা এযাবৎকাল সারা পৃথিবীতে পশুসম্পদ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এগুলো হলো-

স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন বলতে এমন কতগুলো স্বাস্থ্যগত বিধিব্যবস্থাকে বোঝায় যা এই যাবৎকাল সারা পৃথিবীতে পশুসম্পদ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।

১. বাসস্থান নির্মাণে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ও দুর্যোগ নিবারণ করা,
২. খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা,
৩. প্রজনন ও প্রসবে জীবাণুমুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা,
৪. মলমূত্র নিষ্কাশন করা,
৫. অসুস্থ গাভী পৃথকীকরণ ও মৃত গাভীর সৎকার,
৬. নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা,
৭. সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

এখানে এগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১. বাসস্থান নির্মাণে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ও দুর্যোগ নিবারণ করা

গোশালা এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে গাভীর জন্য পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

গোশালা এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে গাভীর জন্য পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকে। একই সাথে এতে গাভীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করারও ব্যবস্থা থাকতে হবে। যে কোনো মধ্যম আকারের গাভী প্রতিদিন ৯০.১ কেজির (২০০ পাউন্ড) অধিক বাতাস গ্রহণ করে। প্রশ্বাসকৃত বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের (CO_2) আধিক্য ০.০৩% থেকে ৫.৫৩%-এ উন্নীত হয়। আর অক্সিজেনের পরিমাণ ২০.৯৪% থেকে ১৪.২৯%-এ কমে যায়। একটি গাভী থেকে অন্যটি কমপক্ষে ১.৫ মিটার (৫ ফুট) দূরে রাখা উচিত। গোশালা নির্মাণের সময় এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। গোশালার জায়গা বরাদ্দও এই ভিত্তিতেই করতে হবে। এতে গাভীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

২. খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা

খাদ্য ও পানির পাত্র সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

খাদ্য ও পানির পাত্র সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। কারণ, পাত্র অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা থাকলে এতে সহজেই বিভিন্ন রোগজীবাণু বাসা বাধবে ও ফলে গাভীর রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। কাজেই এই দিকটায় বিশেষ নজর দিতে হবে।

৩. প্রজনন ও প্রসবে জীবাণুমুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা

কৃত্রিম প্রজননে রোগব্যাধি ছড়ানোর প্রকোপ কম থাকলেও নির্জীবাণু পদ্ধতি অবলম্বন করা না হলে রোগব্যাধি ছড়াতে পারে।

প্রজনন ও প্রসবের মাধ্যমে গাভীতে রোগব্যাধি ছড়াতে পারে। সাধারণত প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ষাঁড়ের মাধ্যমে প্রজনন করালে এই সম্ভাবনাটা বেশি থাকে। কৃত্রিম প্রজননে রোগব্যাধি ছড়ানোর প্রকোপ অনেক কমে যায়। কিন্তু তা যদি নির্জীবাণু পদ্ধতিতে করা না হয় তাহলে রোগব্যাধি ছড়াতে পারে, বিশেষ করে যৌন রোগসমূহ। সুতরাং কৃত্রিম প্রজননের প্রতিটি পদক্ষেপ নির্জীবাণু পদ্ধতিতে করতে হবে। তবেই যৌনব্যাধি ছড়ানো বন্ধ হতে পারে। তাছাড়া প্রসবকালেও যথারীতি ধাত্রীবিদ্যার

নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। তা না হলে গাভী রোগজীবাণু কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারে। প্রতিটি ডেয়রি ফার্ম বা পারিবারিক দুগ্ধ খামারে জীবাণুমুক্ত ধাত্রীকক্ষ রাখতে হবে। নির্জীবাণু পদ্ধতি ব্যবহারের সর্বোত্তম পন্থা হলো পরিষ্কার ও ফুটানো পানি দিয়ে যন্ত্র পাতি ধৌত করা। বাণিজ্যিকভিত্তিতে পরিচালিত বড় দুগ্ধ খামারগুলোতে অটোক্লেভ (autoclave) নামক যন্ত্র দিয়ে যন্ত্র পাতি জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করা হয়।

ডেয়রি ফার্ম বা পারিবারিক দুগ্ধ খামার যেখানেই গাভী লালনপালন করা হবে সেখানেই মলমূত্র নির্গমণ ও নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪. মলমূত্র নিষ্কাশন করা

ডেয়রি ফার্ম বা পারিবারিক দুগ্ধ খামার যেখানেই গাভী লালনপালন করা হবে সেখানেই মলমূত্র নির্গমণ ও নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। গাভীর বাসস্থানে সেরকম নর্দমা ও পয়ঃপ্রনালী তৈরি করতে হবে যাতে মলমূত্র উপজাত হিসেবে সার বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করা যায়। প্রতিদিন অন্তত একবার পানি ঢেলে গোশালা পরিষ্কার করতে হবে। মাসে অন্তত একবার জীবাণুনাশক ওষুধ, যেমন- ফিনাইল (phenyle) বা আয়োসান (iosan) দিয়ে শোধন করতে হবে। এতে মলমূত্র থেকে গাভীতে রোগব্যাধি ছড়ানো ও পরিবেশ দুষিত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।

দুগ্ধ খামারে কোনো গাভী সংক্রামক রোগে মারা গেলে তার সৎকার প্রয়োজন। মৃত গাভীর শবদেহ মাটির ০.৫ মিটার নিচে গর্ত করে পুঁতে ফেলে তার উপরিভাগে চুন বা ডি.ডি.টি. (D.D.T.) ছড়িয়ে শোধন করতে হবে।

৫. অসুস্থ গাভী পৃথকীকরণ ও মৃত গাভীর সৎকার করা

যে কোনো দুগ্ধ খামারে মৃত গাভীর সৎকার করার যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হবে। গাভী কোনো সংক্রামক রোগে মারা গেলে তার সৎকার প্রয়োজন। মৃত গাভীর শবদেহ মাটির ০.৫ মিটার নিচে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে এবং উপরিভাগে চুন বা ডি.ডি.টি. (D.D.T.) ছড়িয়ে শোধন করতে হবে। আর অসুস্থ গাভীগুলোকে আলাদা কক্ষে রাখা উচিত, বিশেষ করে অসুখটি যদি কোনো সংক্রামক ব্যাধি হয়। ছোঁয়াচে গর্ভপাত বা ব্রুসেলোসিস রোগ হলে তা স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা দিয়েই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ছোঁয়াচে গর্ভপাত গাভীর একটি মারাত্মক ব্যাধি। স্যাঁতস্যাঁতে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এই রোগের বিস্তার ঘটে। এই রোগের উৎস সব সময়ই কোনো না কোনো প্রসূতি গাভী। প্রসূতি কক্ষে কোনো গাভী থাকাকালীন ৩-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত অন্য সুস্থ গাভীর সংশ্রবে আনা যাবে না। একাধিক গাভী প্রসূতি হলে ঘরের মধ্যে বেড়া দিয়ে আলাদা করে রাখতে হবে। বাচ্চা প্রসবের পরে প্রসূতি কক্ষগুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে শোধন করতে হবে। গর্ভপাতের ক্ষেত্রে ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো ওষুধ দেয়া যেতে পারে।

চিত্র ৬২ ঃ একটি সুস্থ সবল গাভী

বহিঃ ও অন্ত ঃ উভয় পরজীবীর বিরুদ্ধেই কৃমিনাশক ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়, বিশেষ করে যকৃৎ ও অন্ননালীর কৃমির জন্য তো বটেই।

৬. নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা

কৃমির ডিম যত্রতত্র বেঁচে থাকার জন্য বাংলাদেশের জলবায়ু বিশেষ উপযোগী। বিভিন্ন ধরনের মাছি, মশা, উকুন, আটালি, অন্যান্য কীটপতঙ্গ ও শামুক কৃমিসহ বেশ কিছু রোগের বাহক। এরা নিজেরাই আবার পরজীবী হিসেবে গাভীর দেহে আশ্রয় নিয়ে বেশ কিছু রোগ সৃষ্টি করে। সুতরাং বহিঃ ও অন্ত ঃ উভয় পরজীবীর বিরুদ্ধেই কৃমিনাশক ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়, বিশেষ করে যকৃৎ ও অন্ননালীর কৃমির জন্য তো বটেই। এছাড়াও রয়েছে কতগুলো এককোষী পরজীবী। বিভিন্ন প্রজাতির কৃমির বিরুদ্ধে কাজ করে এমন কৃমিনাশক ওষুধ নিকটস্থ ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো নিয়মিত ব্যবহার করে গাভীর কৃমি দমন করা যায়।

নিকটস্থ ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো গাভীকে নিয়মিত সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা দেয়া পশু রোগ নিবারণের সর্বোত্তম পন্থা।

৭. সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করা

গাভীর সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে খুরা রোগ (foot and mouth disease), তড়কা (anthrax), বাদলা (black quarter), গলাফোলা (haemorrhagic septicaenia), সংক্রামক গর্ভপাত (brucellosis), জলাতঙ্ক (rabies) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ম্যাস্টাইটিস (mastitis) বা ওলানপ্রদাহ দুগ্ধবতী গাভীর একটি অতি সাধারণ রোগ। উপরোক্ত রোগগুলোর প্রতিষেধক বা টিকা সরকারীভাবে এদেশে তৈরি হয় এবং তা বিভিন্ন পশু হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারিতে সরবরাহ করা হয়। কাজেই নিকটস্থ ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো গাভীকে নিয়মিত এসব সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা দেয়া পশু রোগ নিবারণের সর্বোত্তম পন্থা। অবশ্য ওলানপ্রদাহের কোনো প্রতিষেধক টিকা নেই। এজন্য ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো চিকিৎসা করাই উত্তম।

সারণি ২৩-এ বাংলাদেশে প্রস্তুত গাভীর বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টিকার নাম, ব্যবহার মাত্রা, প্রয়োগ পদ্ধতি ও সময় উলে-খ করা হয়েছে।

সারণি ২৩ ঃ বাংলাদেশে প্রস্তুত গাভীর বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টিকার নাম, ব্যবহার মাত্রা, প্রয়োগ পদ্ধতি ও সময়

নাম	ব্যবহার মাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি	সময়
তড়কা রোগের টিকা	১ মি.লি.	গলার ঢিলা চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হবে	বছরে একবার টিকা প্রয়োগ করা হয়
বাদলা রোগের টিকা	৫ মি.লি.	গলার ঢিলা চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হবে	৬ মাস অন্তর টিকা দিতে হবে
খুরা রোগের টিকা	ট্রাইভ্যালেন্ট- ৯ মি.লি. ডাইভ্যালেন্ট- ৬ মি.লি. মনোভ্যালেন্ট- ৩ মি.লি.	গলাকম্বলের ত্বকের নিচে ইনজেকশন দিতে হবে	৪-৬ মাস পরপর টিকা দিতে হবে
গলাফোলা রোগের টিকা	২ মি.লি.	গলার ঢিলা চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হবে	বছরে একবার টিকা দিতে হবে
রিন্ডারপেস্ট রোগের টিকা	১ মি.লি.	চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হবে	একবার প্রয়োগ করলে কয়েক বছর পর্যন্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে

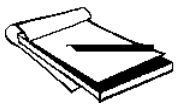

অনুশীলন (Activity) ঃ *গাভীর রোগপ্রতিরোধ করার জন্য যা যা করা উচিত তা যুক্তিসহকারে লিখুন।*

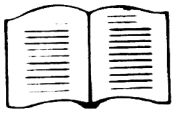

সারমর্ম ঃ স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন বলতে এমন কতগুলো স্বাস্থ্যগত বিধিব্যবস্থাকে বোঝায় যা এযাবৎকাল সারা পৃথিবীতে পশুসম্পদ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এগুলো হলো– বাসস্থান নির্মাণে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ও দুর্যোগ নিবারণ করা, খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রজনন ও প্রসবে জীবাণুমুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা, মলমূত্র নিষ্কাশন করা, অসুস্থ গাভী

পৃথকীকরণ ও মৃত গাভীর সৎকার করা, নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা, সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করা ইত্যাদি। গাভীর বিভিন্ন রোগ দমনের জন্য ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো সময়ে টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক ব্যবহার করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। প্রতি ঘন্টায় একটি মধ্যম আকারের গাভী কী পরিমাণ বাতাস গ্রহণ করতে পারে?
- ক) ৭৫.১ কেজির বেশি
- খ) ১০০.১ কেজি
- গ) ৯০.১ কেজির বেশি
- ঘ) ১২১.১ কেজি

২। গাভীর প্রশ্বাসকৃত বাতাসে অক্সিজেন কত % থেকে কমে কত %-এ নেমে আসে?
- ক) ২০.৯৪% থেকে ১৪.২৯%
- খ) ২২.৯৪% থেকে ১৬.২৯%
- গ) ২০.৯৪% থেকে ১৫.২৯%
- ঘ) ২১.৯৪% থেকে ১৪.২৯%

৩। গাভীর মৃতদেহ মাটির কত গভীরে পুঁততে হবে?
- ক) ১.০ মিটার
- খ) ০.৭৫ মিটার
- গ) ০.২৫ মিটার
- ঘ) ০.৫ মিটার

৪। বাংলাদেশে খুরা রোগের কী কী টিকা আছে?
- ক) মনোভ্যালেন্ট ও ডাইভ্যালেন্ট
- খ) মনোভ্যালেন্ট, ডাইভ্যালেন্ট ও ট্রাইভ্যালেন্ট
- গ) ডাইভ্যালেন্ট ও ট্রাইভ্যালেন্ট
- ঘ) ডাইভ্যালেন্ট ও টেট্রাভ্যালেন্ট

ব্যবহারিক

পাঠ ৫.৪ গাভীর দানাদার খাদ্য প্রস্তুত করা

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ আনুপাতিক হারে মিশিয়ে দুগ্ধবতী গাভীর জন্য দানাদার খাদ্য প্রস্তুত করতে পারবেন।

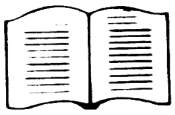

খাদ্য তৈরির পদ্ধতি সব গাভীর জন্যই একই রকম। তবে, পালন পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণে খাদ্য উপকরণগুলোর পরিমাণ কমবেশি হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

দুগ্ধবতী গাভীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপকরণ ও খাদ্যতালিকাসম হ তাত্ত্বিক পাঠে (পাঠ ৫.৩) আলোচনা করা হয়েছে। খাদ্য তৈরির পদ্ধতি সব গাভীর জন্যই একই রকম। তবে, পালন পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণে খাদ্য উপকরণগুলোর পরিমাণ কমবেশি হয়ে থাকে। এই পাঠে দুগ্ধবতী গাভীর দানাদার খাদ্য প্রস্তুত করার একটি নমুনা দেখানো হয়েছে।

দুগ্ধবতী গাভীর জন্য ১০ কেজি দানাদার খাদ্যের প্রস্তুত প্রণালী

প্রয়োজনীয় উপকরণ

এজন্য সারণি ২৪-এ উল্লেখিত পরিমাণ খাদ্য উপকরণ বিভিন্ন পাত্রে সংগ্রহ করুন। তাছাড়া কলম, পেন্সিল, রাবার, ব্যবহারিক খাতা, একটি ছালার বস্তা ইত্যাদিরও প্রয়োজন হবে।

সারণি ২৪ ঃ দুগ্ধবতী গাভীর দানাদার খাদ্যের উপকরণসম হের পরিমাণ

উপাদান	পরিমাণ
তিলের খৈল	২.৫ কেজি
ভুট্টার গুঁড়ো	২.৫ কেজি
গমের ভুশি	২.৫ কেজি
খেসারির ডাল	২.৫ কেজি

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এরসঙ্গে ৬০ গ্রাম খণিজপদার্থ ও ১২০ গ্রাম খাদ্য লবণের প্রয়োজন হবে।

পরিমাণে কম এমন উপকরণগুলো, যেমন- খণিজপদার্থ, খাদ্য লবণ প্রভৃতি একসঙ্গে ভালোভাবে মেশান। এরপর অন্যান্য উপকরণগুলোও পর্যায়ক্রমে একত্রে ভালোভাবে মেশান।

কাজের ধাপ

- প্রথমে ঘরের শুকনো মেঝে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করুন।
- পরিমাণে কম এমন উপকরণগুলো, যেমন- খণিজপদার্থ, খাদ্য লবণ প্রভৃতি একসঙ্গে ভালোভাবে মেশান।
- এরপর অন্যান্য উপকরণগুলোও পর্যায়ক্রমে একত্রে ভালোভাবে মেশান।
- এই মিশ্রণের সঙ্গে পূর্বে মিশ্রিত খণিজপদার্থ ও খাদ্য লবণের মিশ্রণ যোগ করুনও ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।
- সমস্ত মিশ্রণটি বস্তায় ভরে মজুদ করুনএবং সেখান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী দুগ্ধবতী গাভীকে খেতে দিন।
- কাজের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও শিক্ষককে দেখান।

ভেজা, স্যাঁতস্যাঁতে বা অপরিচ্ছন্ন স্থানে খাদ্য মিশ্রিত করবেন না।

সাবধানতা

- ভেজা, স্যাঁতস্যাঁতে বা অপরিচ্ছন্ন স্থানে খাদ্য মিশ্রিত করবেন না।
- খাদ্য মিশ্রণ করার পূর্বে অবশ্যই খাদ্য উপকরণের গুণাগুণ পরীক্ষা করে নিন।
- ভেজা বা ছত্রাকযুক্ত ও দুষিত খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করবেন না।

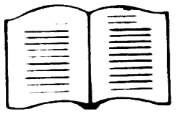

সারমর্ম ঃ খাদ্য তৈরির পদ্ধতি সব গাভীর জন্যই একই রকম। তবে পালন পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণে খাদ্য উপকরণগুলোর পরিমাণ কমবেশি হয়ে থাকে। পরিমাণে কম এমন উপকরণগুলো, যেমন- খণিজপদার্থ, খাদ্য লবণ প্রভৃতি একসঙ্গে ভালোভাবে মেশাতে হবে। এরপর অন্যান্য উপকরণগুলোও পর্যায়ক্রমে একত্রে ভালোভাবে মেশাতে হবে। ভেজা, স্যাঁতস্যাঁতে বা অপরিচ্ছন্ন স্থানে খাদ্য মিশ্রণ করা যাবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। দানাদার খাদ্যে তিলের খৈলের পরিমাণ কত?
- ক) ০.৫ কেজি
- খ) ১.৫ কেজি
- গ) ২.৫ কেজি
- ঘ) ৩.৫ কেজি

২। কোন্ ধরনের খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করা উচিত নয়?
- ক) ভেজা ও স্যাঁতস্যাঁতে
- খ) ছত্রাকযুক্ত
- গ) দুষিত
- ঘ) ভেজা বা ছত্রাকযুক্ত ও দুষিত

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৫

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। গোশালা তৈরিতে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হবে?

২। গাভীর সাধারণ বদঅভ্যাস বা দোষত্রুটিগুলো কী কী? এগুলো কীভাবে নিরাময় করা যায়?

৩। গাভীর প্রজনন ও প্রসবগত পরিচর্যা বর্ণনা করুন।

৪। গাভীর খাদ্যের প্রয়োজন হয় কেন? খাদ্য সুষম হওয়ার শর্ত কী কী?

৫। রেশন বা খাদ্যতালিকা কী? ২০০-২৫০ কেজি ওজনের দুগ্ধবতী গাভীর জন্য একটি খাদ্যতালিকা তৈরি করুন।

৬। খাদ্য সংরক্ষণ করা হয় কেন?

৭। খড় প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করুন।

৮। গাভীর স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালনের বিধি ব্যবস্থাগুলো কী কী?

৯। কীভাবে প্রজনন ও প্রসবে নির্জীবাণু পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে?

১০। বাংলাদেশে তৈরি গাভীর বিভিন্ন সংক্রামক রোগের টিকার নাম, ব্যবহার মাত্রা, প্রয়োগ পদ্ধতি ও সময় বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা - ইউনিট ৫

পাঠ ৫.১

১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। গ

পাঠ ৫.২

১। ক ২। ঘ ৩। গ ৪। খ ৫। ক ৬। গ

পাঠ ৫.৩

১। গ ২। ক ৩। ঘ ৪। খ

পাঠ ৫.৪

১। গ ২। ঘ